Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 79-85
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ছোটগল্পকার আশাপূর্ণা দেবী ও তাঁর 'সীমারেখার সীমা' গল্পে নারীর জীবনভাষ্য: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

অভিজিৎ সাহা
গবেষক (পি.এইচ. ডি), বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম

Abstract

Beside a litterateur, a writer is a person of society too. Before she starts writing for this society, she is a human being at first. And she has understood the good or evil points of the society. Her devotion of literary work reflected from her overall lifestyle. It is true that she has a very clear observation to the evil part of the society, but it doesn't mean that she starts her writing to remove those evil elements from the society. Rather her concept is to show the sights regarding good and bad thing effects a good thing. And she conveys her observation as a message to the society.

In the first decade of the 20th century the great story-writer Ashapurna Devi (1909 – 1995) was born in a very conservative society. Since 1923 for long 72 years, her literary works involved various flavours and aspects of society. As she belonged to a conservative middleclass family, she was able to find out the corrupting sights of the society. She even perceives the problem of every women wheather she is a baby girl or an old lady. She was simultaneously a lady writer and a woman who belonged to the 20th century. And for that reason she tried to reflect the agonies of those women who belonged to the same middleclass family in her writing again and again. She though didn't care to get an emblem of feminist, she just wanted to spread her message to every Women's heart-touching story to the society.

There is a history behind the prosperity of women of present society. It is no doubt, the huge contribution of Raja Rammohon Roy and Vidyasagar that they stood beside women at that time and helped them to reach where the women is right now. It is tough specially for those who belonged to conservative families to break their barriers. One of them was Ashapurna Devi who also belonged to a conservative family as well as society. Therefore, in her short stories there is always a reflection of those girls who fight against those obstacles and barriers and how they finally overcome those unbearable pain. Along with their particular informations about their own lifestyle in her stories she also focused on the surrounding problems, those girls used to face everyday. Specially, the problem which the women continuously facing after joining at her work place both in her own home and at her workplace, is also reflected in her short stories.

Key Words: Ashapurna Devi, Women, Society, Life , Problem, Reflection.

(এক)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীরা তাঁদের হৃদয়কথা ব্যক্ত করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের কথা তাঁরা আপন লেখনীর মাধ্যমে ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফলে বহুসংখ্যক লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যের দরবারে। তাঁরা কেউ ছিলেন কথাসাহিত্যিক, কেউ বা ছিলেন কবি, কেউ আবার প্রাবন্ধিক। সেই সঙ্গে এমন কিছু লেখিকারও আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। এমনই একজন প্রোথিতযশা লেখিকা হলেন আশাপূর্ণা দেবী। তাঁর লেখায় যেমন সাধারণ মধ্যবিত্ত নারীর কথা ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি বিংশ শতাব্দীর আধুনিক নারীর নানান সমস্যার কাহিনিগুলিও তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। নারীর হৃদয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ছোটগল্পে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর নারীদরদী শিল্পী রূপে ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নারী-পুরুষ চরিত্রের তুলনায় তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং আশাপূর্ণা মনে করেন, "নারী-চরিত্রকেই যেন অধিক যত্ন নিয়ে এঁকেছেন।"[১] শরৎচন্দ্র অধিক যত্নের সঙ্গে তাঁর নারীদের আঁকলেও তিনি ছিলেন একজন পুরুষ। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী নিজে একজন নারী; আর তাই একজন নারী হয়ে নারীর হৃদয় কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয় সেই সকল কথা ব্যক্ত করতেই কলম ধরেছিলেন তিনি। তাঁর ছোটগল্পে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সেই সব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, সকল প্রতিকূলতাকে ছাপিয়ে, সকল পরিস্থিতিকে জয় করে নারীরা কীভাবে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে তথা রাখতে সক্ষম হয়েছে সেই জীবন যুদ্ধের কাহিনিই প্রতিফলিত হয়েছে লেখিকার ছোটগল্পের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে। জীবনের সেই সমস্যার কথাকে কেন্দ্রে রেখে ছোটগল্পকার আশাপূর্ণা দেবীর **'সীমারেখার সীমা'** শীর্ষক গল্পে নারীর জীবনভাষ্য ব্যাপারটি হল আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাণবস্তু।

(দুই)

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির পূর্বে "টুকরো টুকরো ছোটোগল্পের মধ্যেই অনেকদিন পর্যন্ত ছিল কলমের ঘোরাফেরা।"[২] মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের অসামান্য রূপকার আশাপূর্ণা দেবী কেবল ব্যাবহারিক জীবনেরই নয় মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের অন্তরলোকের টুকরো টুকরো ছবিও তুলে ধরেছেন তাঁর সেই সমস্ত ছোটগল্পে। তাঁর সেই ছোটগল্পগুলি সম্পর্কে সমালোচক অরুণকুমার বসু মনে করেন, "আমাদের চেনাকালের — গত চল্লিশ বছরের মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের দর্পণ তাঁর ছোটগল্প।"[৩] লেখিকা অভিজ্ঞতা পুষ্ট চোখে জীবনকে দেখলেও তাঁর দেখার মধ্যে কোনো মেয়েলিয়ানা নেই। আর তাই পুরুষ লেখকগোষ্ঠী মনে করতেন তাঁর লেখা "আসলে পুরুষের লেখা। এমন বলিষ্ঠ লেখা।"[৪] — তাঁর এই বলিষ্ঠ লেখায় যে মানুষগুলির সাক্ষাৎ পাই তারা নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ, সংসারী মধ্যবিত্ত নারী-পুরুষ, অতি পরিচিত, অতি প্রাণবন্ত। তাঁর গল্পে মেয়েরা পুরুষ চরিত্রের তুলনায় অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, অনেক বেশি পূর্ণতা লাভ করেছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি গৃহের অন্তঃপুর থেকেই মেয়েদের বাইরের কথা প্রত্যক্ষ করেছিলেন আশাপূর্ণা। আর সেই কথাগুলোই উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যের পাতায়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, "যা লিখেছি আমার দেখা মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডি থেকেই দেখা।"[৫]

আশাপূর্ণা আধুনিক মেয়েদের কথা বলেছেন; কিন্তু আধুনিকতা বিলাসীদের প্রশ্রয় দেননি। তাঁর লেখা যেমন বাঙালি মেয়েদের উজ্জীবিত করেছে, তেমন অনেক লেখাতেই ছেলেদেরও গভীর মননের কথা ধরা পড়েছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মর্যাদা এবং শ্রম বিভাজনের থেকে বিশাল পার্থক্য তাঁকে ছোটবেলা থেকে ভাবিত করেছিল। তাঁর ভাবনায় সেই ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে এভাবে, "যখন আমার খুব কম বয়স তখন থেকেই দেখতাম পারিবারিক জীবনে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে — আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই বলছি — ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশি তফাৎ। মেয়েরা যেন কিছুই নয় আর ছেলেরাই পরম মানিক, এই রকম ব্যাপার। এটা

আমাকে খুব বিদ্ধ করত। ..... সব জায়গাতেই দেখতাম পুরুষদের প্রবল প্রতাপ। ..... অল্পবয়সী মেয়েদের, বিশেষ করে বৌ-দের জীবন ছিল দুঃখের নিরুপায়ের, যেগুলো মনকে দারুণ অস্থির করত।"[৬] সহজ কথা সহজে বলার কঠিন কাজটাই তিনি করে গেছেন আজীবন। কাউকে কখনও তিনি বিমুখ করতে পারতেন না।

আশাপূর্ণা দেবীর নাম করলেই তাঁর গল্পের পরিবেশ, পরিস্থিতি, মানুষ-জন, আখ্যানের বৈশিষ্ট্য, লেখিকার দৃষ্টিকোণ সব একসঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে পাঠকের স্মৃতিতে ও ভাবনায়। পাঠক জানেন এই লেখিকার কাছে তার প্রত্যাশা কী; পাঠক বিশ্বাস করেন—আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প হাতে নিলে তার প্রত্যাশা পূরণে কোনো অতৃপ্তি থাকবে না। তাঁর গল্পের পাঠক সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "তাঁর একটা লেখাও কখনও ফেলনা মনে হয়নি।"[৭] আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে এই নিরাসক্ত সত্য দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন বলেই আশাপূর্ণা দেবী মহৎ সাহিত্যিক। বিশেষ করে ছোটগল্পে আছে একক প্রতীতির উপলব্ধি - যার বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় একটি বাহুল্য বর্জিত আখ্যান। নিঃসংশয়ে ছোটগল্পই তাঁর প্রিয় হাতিয়ার —যার মধ্যে আশাপূর্ণার মেধার ঔজ্জ্বল্য তীব্রতম এবং বৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি সর্বাধিক। সেখানে আশাপূর্ণার লেখক চরিত্রের এক স্বচ্ছ কাঠিন্য প্রতিভাত হয়। এক্ষেত্রে উপাসনা ঘোষের মন্তব্যটি তুলে ধরা যেতে পারে, "জীবনে যা হয় আশাপূর্ণা তার রূপকার। গূঢ় মানব মন উন্মোচন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।"[৮]

উপন্যাস আশাপূর্ণাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে বেশি, কিন্তু তিনি বলেন "ছোটোগল্পই আমার 'প্রথম প্রেম'।"[৯] তিনি আরও বলেন, "আমার লেখার উপজীব্য বিষয় কেবলমাত্র মানুষ।"[১০] প্রথম প্রেমের উপজীব্য ছোটগল্পের মধ্যেই সেই মানুষগুলো পেয়েছে চরম পরাকাষ্ঠা। চেনা চারদেওয়ালে সীমাবদ্ধ জগতের মধ্যেই সেই মানুষগুলোর কত রূপ-রস-গন্ধ। এই মানুষগুলোর মধ্যে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে নারী মানুষ। চার দেওয়ালে সীমাবদ্ধ নারী জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, যন্ত্রণা, অভিজ্ঞতার নানা কাহিনি তিনি বলে গেছেন তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে। পর্দানশীন যুগের মেয়ে হয়েও একালের মন নিয়ে মধ্যবিত্ত নারী জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রুচির পরিবর্তন হয়, তেমনই আশাপূর্ণা দেবীরও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু হয়েছে আধুনিক জীবনকেন্দ্রিক। যুগ আধুনিক হলেও সেই আধুনিক সমাজের নারীজীবনের সমস্যা ও অবস্থানের কথা উঠে এসেছে তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে। ছোটগল্প হল ছোট জায়গা জুড়ে পড়ে থাকা কয়েক ফোঁটা জলের মতো, যার মধ্যে বৃহৎ আকাশটিকে দর্শন করা যায়। আশাপূর্ণা দেবীও তাঁর ছোটগল্পে নারীর জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার বৃহৎ আকাশটিকে তুলে ধরেছেন। বর্তমানের পারিবারিক সংঘাত আর দুটি মনের বা ব্যক্তির সংঘাত নয়, একেবারে আদর্শের সংঘাতচিত্র তাঁর ছোটগল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। গল্পগুলি বাস্তব ঘটনাজাত হলেও চারিত্রিক সংঘাত, সম্পর্কের টানাপোড়েন, আশাভঙ্গের বেদনা, হতাশা, হিংসা, অশুভ চিন্তা, কুটিল মানসিকতা, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কঠোর সংঘর্ষ, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বই তাঁর গল্পগুলোর বিশাল পরিসর জুড়ে রয়েছে।

আধুনিক কথাসাহিত্যের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হল চরিত্রের প্রাধান্য; আশাপূর্ণাও তা থেকে ব্যাতক্রম নন। তিনি চরিত্রকেই প্রথম প্রাধান্য দেন এবং পরে চরিত্রের পিছু পিছু ঘটনা সাজিয়ে চলেন। চরিত্রকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ঘটনার অদল-বদল ঘটে। লেখিকা আপন সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে নিজেকে খুঁজে পান আবার পাঠক সেই চরিত্রে নিজ পরিচিত ছবিকেই দেখে চলেন প্রতিনিয়ত। এভাবেই সাহিত্য হয়ে ওঠে আদর্শ সাহিত্য। উপন্যাসের মতো আশাপূর্ণার ছোটগল্পের নারীরাও তাঁর এক একটি রক্তবীজ থেকে জন্মানো আদর্শ চরিত্র। বলা বাহুল্য যে, এই চরিত্রগুলো সৃষ্টিকালে লেখিকার অন্তরালে আপন 'আমি'টি কাজ করত। আদর্শ সেই নারী চরিত্রগুলোর মনের নিভৃতে আলোক নিক্ষেপ করে তাদের মনের গোপন চাপা দুঃখ-কষ্টের কথাগুলোকে দেখানোই ছোটগল্পকার আশাপূর্ণা দেবীর কাজ। আলোচনার পরবর্তী অংশে নির্বাচিত ছোটগল্পটি যেন নারীমনের সেই দুঃখ-বেদনা জর্জরিত সমস্যারই ইঙ্গিতবাহী একটি প্রতিনিধি স্থানীয় শ্রেষ্ঠ গল্প।

(তিন)

আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে লক্ষ করা যায়, বৈদিক যুগে নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু যতদিন অগ্রসর হয়েছে পুরুষতন্ত্রের দাপটে নারীর স্বকীয় অস্তিত্ব বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। বিশেষ করে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় দেখা গেছে নারীর অবস্থা আরও বেশি শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। লক্ষণীয় যে, সেই সময়ের সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর সহযোগিতা ছিল অপরিহার্য এবং স্বাতন্ত্র্য ছিল অনিবার্য। সেকালের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর একমাত্র আদর্শ ছিল পুরুষের অধীনে থেকে সতীত্ব রক্ষা করে একপক্ষীয় যৌনশুচিতা বজায় রেখে পুত্র সন্তান দান করা এবং অবিচার ও অবদমনের শিকার হওয়া। ঊনবিংশ শতাব্দী অর্থাৎ আধুনিক যুগে দেখা গেল সমাজ সংস্কারকরা নারীমুক্তি আন্দলনে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। নারী শিক্ষা থেকে শুরু করে বিধবাবিবাহ সবকিছুই ছিল নারীর জন্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসেও নারীর মুক্তি বা সমস্যার সমাপ্তি ঘটেনি। এই সময়ের সৃষ্ট সাহিত্যে সেই প্রমাণ সমূহ পাওয়া যায়। বিশ শতকের প্রখ্যাত লেখক-লেখিকাদের মতো আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পেও এসেছে বাঙালি ঘরের সাধারণ নারীর কাহিনি। এ প্রসঙ্গে নবনীতা দেবসেন বলেন, "আধুনিক বাঙালী জীবনের সমস্যা নিয়ে লেখার জন্যে তাঁর শুধু সময় সচেতনতাটুকুই যথেষ্ট।"[১১] — বাঙালি নারীজীবনের প্রাত্যাহিক খুঁটিনাটি প্রকাশিত হয়েছে আশাপূর্ণার ছোটগল্পে। যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে ফলে অন্তঃপুরের পর্দার আড়ালে থাকা সাধারণ নারী পরিস্থিতির চাপে পড়েই হোক বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যেই হোক বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা বাইরে চলে আসার ফলে গৃহ জীবন ও বাইরের জীবন দুই ক্ষেত্রেই নারী এবং পুরুষ উভয়েরই যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেসব সমস্যাই তিনি তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। ছোটগল্প লেখার সময় তাঁর দৃষ্টি মূলত গৃহকেন্দ্রেই নিবদ্ধ ছিল। পারিবারিক জীবনে এমন অনেক সংঘাত আছে যাকে কেবল সূক্ষ্ম ভাবে অনুভব করলেই তার তীব্রতা অনুভব করা যায়। স্বামী-স্ত্রী, শাশুড়ি-বধূ (বিশেষ করে সেকালের শাশুড়ি আর একালের আধুনিক বধূ), শ্বশুর-পুত্রবধূ, দাদা-বোন, দেবর-বৌদি, কাজের মেয়ে প্রভৃতি নিয়ে যে সংসার এবং এইসব সম্পর্কের মধ্যে যে ছোটখাটো সংঘাত — সেই সংঘাতের ফলে যে দীর্ঘশ্বাস, চোখের জল এবং সম্পর্কের ফাটল ধরে সমস্তই উঠে এসেছে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে। সংসারের এই চতুষ্কোণ আশাপূর্ণার কলমের বিচরণস্থল হলেও পিতা-মাতা-সন্তান এই ত্রিকোণ সম্পর্কের দিকেও আশাপূর্ণার ছিল অবাধ দৃষ্টি। আসলে, "বাঙালি সাধারণ পরিবারগুলির নারী-পুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী জীবনের ছবি তাঁর কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে সমাজ বিজ্ঞানীর অখণ্ড নিপুণ দৃষ্টিপাতে।"[১২] ফলে তিনি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন নারীজীবনের সমস্যাগুলো। নারীর এই সমস্যাগুলো কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর সেরা কয়েকটি ছোটগল্প পর্যালোচনা করলেই তা অনুধাবন করা যাবে ।

মধ্যবিত্ত সমাজে পিতার অবর্তমানে বড়ো দাদার অধীনস্ত হয়ে দাসীর মতো সংসারের সমস্ত কাজ আপন কাঁধে নিয়ে মুখ বুজে অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করে থাকতে হয় সমাজের কিছু সহনশীল নারীকে। ছাইচাপা প্রতিবাদের আগুন অন্তরে জ্বলে উঠলেও তাকে তাকিয়ে দেখতে হয় পরের সংসারের লক্ষণগণ্ডির সীমানার দিকে। পিতার অনুপস্থিতিতে পিতৃতন্ত্রের বিনাশ হলেও পুরুষতন্ত্রের হাত থেকে নারীর নিস্তার নেই। তাই কালের নিয়মে এক পুরুষতন্ত্র থেকে অন্য এক পুরুষতন্ত্রে নারীকে পদার্পণ করতে হয়। কিন্তু সেখানেও মুক্তি নেই, নেই দুদণ্ড শান্তি। তাই শ্বশুরগৃহের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে নিজেকে সরে আসতে হয় পিতার ঘরে। পিতা অবর্তমান কিন্তু পুরুষতন্ত্র তো অবর্তমান নয়; সেই পুরুষতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে বলিদান দিতে হয় নিজের সুখ-শান্তি, হর্ষ-বিষাদ, এমনকি সিঁথির সিঁদুরও। এমনই এক নারীর করুণ জীবনালেখ্য আশাপূর্ণা দেবীর 'কাঁচ পুঁতি হীরে' (১৯৬৭ খ্রি:) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত প্রথম স্থানীয় **'সীমারেখার সীমা'** (শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ) গল্পটি। ভাইঝির বিয়েকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গল্পের প্লট। সারাদিন ধরে ভাইঝির বিয়ের সমস্ত কাজকর্ম করার পর ছবি তিনতলায় টালীর ছাতের অন্ধকার চিলেকোঠায় ঢুকে সারারাত পাগল স্বামীর শব আগলে দরজা বন্ধ করে রাখে যাতে বিবাহবাসরটি পণ্ড না হয়ে যায়। ভালো করে খবরাখবর না নিয়েই পিতৃতুল্য বড়ো দাদা সতীনাথ ছোটবোন ছবির বিয়ে দিয়েছিল

পাগল একটি ছেলের সঙ্গে। ভাই পাগল বলে ভাসুরের ঘরে ছবি ও তার স্বামী ক্ষিতীশের জায়গা হয়নি। দায়ে পড়েই ছবিকে ফিরে আসতে হয়েছিল সতীনাথের সংসারে। বছরের অন্যান্য দিন ক্ষিতীশের পাগলামিকে প্রশ্রয় দিলেও মেয়ের বিয়ের আসরে আত্মীয় স্বজনদের সামনে ক্ষিতীশ যখন এঁটো খাবার (লুচি, মিষ্টি, চপ, ফ্রাই) নিয়ে খেতে বসে যায়, তখন সতীনাথ লজ্জায় ক্ষোভে পাগল হয়ে বোনাইকে জোরে ধাক্কা দিয়ে বিয়ের আসর থেকে বের করে দেন। সতীনাথের এই দুর্ব্যবহারে আত্মসম্মানে অভিমানী ক্ষিতীশ অপমানে খান খান হয়ে ঘরে গিয়ে আত্মহত্যা করে। এই মৃত্যুসংবাদ আদরের ভাইঝির বিবাহকে যেন নষ্ট না করে তাই দরজার একটি কোণে অনড় অটল ছবির মতো শব আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ির ছোটমেয়ে ছবি। অনেকেই তাকে খাবার জন্য, নতুন বরকে দেখার জন্য, বিয়ে আসরে বসার জন্য বারবার ডেকে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু ছবি চায়নি তার বৈধব্য দশা ভাইঝির বিয়ের আসরকে পণ্ড করুক। এভাবে সারাজীবন ধরে নারীকে পরের মঙ্গল কামনায় আত্মসুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে শুনতে হয়েছে অন্যের কু-মন্তব্য এবং তাদের কপালে জুটেছে তিরস্কার। একদিকে স্বামীর অপমান অন্যদিকে স্বামীর মৃত্যু এই দুই আঘাতের যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত ছবিকে বুকে পাথর চাপা দিতে হয়েছে। সমাজ সংসারে ছবির মতো অনেক মেয়েকে সেই কাজ করে নিশ্চল থাকতে হয়। সকাল থেকে শুভ কাজে বাধা আসবে সেকথা চিন্তা করে দরজার একপাঁট ধরে দাঁড়িয়ে এক এক করে সকলকে দোরগোড়া থেকে বিদায় করতে করতে ক্লান্ত ছবি একটু শোবার সময় পায়নি। এরজন্য কেউ ছবিকে সহানুভূতি দেখালেও নিচে নেমে গিয়ে তারাই আবার উল্টো গাইতে বসে। কেউ ধরে নিল ছবি স্বামীর মত পাগল হয়েছে। সতীনাথের স্ত্রী মনে করলেন, "দাদার মেয়ের এত ভালো বিয়ে হলো, অমন সুন্দর বর হলো, এতে বুক ফেটে যাচ্ছে তার।"[১৩] দাদা সতীনাথও কড়া গলায় মন্তব্য করেন, "অসভ্যতারও একটা সীমা থাকে ছবি, থাকা উচিত।"[১৪] শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন— "বেইমান হলে এইরকমই হয় বটে।"[১৫] — এমন নানা ধরণের কুরুচিকর কটু মন্তব্য শুনেও প্রবল ধৈর্য সহকারে বিয়ে শেষ না হওয়া অবধি দরজায় স্বামীর মৃতদেহ আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সহনশীল ছবিকে। গল্পে লেখিকার উক্তি, "যেন ঘরের দরজায় কে তাকে গণ্ডি কেটে দিয়ে আটকে রেখে গেছে সীতার মত।"[১৬] — ওই গণ্ডিটি পেরোলেই যেন রাবণরূপী সমাজের মুখে পড়তে হবে ছবিকে।

দাদা, বৌদি, ভাইঝি একে একে সকলে ফিরে গেছে; আসল সত্য কেউই উদ্ধার করতে পারেনি। বরং, মিথ্যে কটুক্তির তিক্ত বাণ ছুঁড়েছে ছবির নামে। পাড়ার চেনা জানা ছেলে অমল যে কৈশোরে কোনো একদিন ছিল ছবির ভালোবাসার মানুষ। বিবাহের আসরে শেষ বৈঠকে বসার অন্তিম ডাকটি ডাকতে এসেছিল সে। কৈশোরের সঙ্গিনী ছবিকে তার দাদা অন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে দেখেও অমল নিজের ভালোলাগার কথা সতীনাথকে জানায়নি। ছবি অমলের এই কাপুরুষতাকে ধিক্কার দেয়নি কোনোদিন। কিন্তু আজ ছবির এতটা বাড়াবাড়িতে লজ্জিত অমলকে ভৌতিক হাসির মুখে জবাব দিতে সে কুণ্ঠাবোধ করে না। ছবি বলে, "আমার নির্লজ্জতায় তুমি হঠাৎ লজ্জা পেতে গেলে কেন অমল ?"[১৭] — এতকিছুর পরও অমলের 'নিষ্ঠুর' অপবাদ ছবিকে শুনতে হয়। কিন্তু অমল যখন ভদ্রলোক দাদা ক্ষিতীশকে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাইয়ে সত্যরক্ষা করতে চাইল তখন ছবি সত্যিকার শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "কালও খাবে না অমল, কাল না পরশু না, কোনোদিন না!"[১৮] — অমল 'ছবি' বলে আর্তনাদ করে এবং বহুকালের ভুলে যাওয়ার একটা বোকামি করে ছবির কপাটে থাকা হাতটি চেপে ধরে। আলো জ্বালতে বলায় ছবি শুধু জিজ্ঞেস করে 'কী হবে ?'— যে অন্ধকার ছবির জীবনে আজ নেমে এসেছে সেখানে আলো জ্বালার মতন তো কেউ নেই। তাই স্বর দৃঢ় করে ছবি জানিয়ে দেয়, "সত্যি দেখার কিছু নেই অমল।"[১৯] তিনতলার ছাতে ভৌতিক পরিবেশে সময় অতিবাহিত করে সত্য উদ্ধারের পর অমলের মনে পড়ে নিচের তলায়ও একটা জগৎ আছে। সেখানে নেমে কী জবাব দেবে সে। কৈশোরের বন্ধু অমলকে তাই ছবির করুণ মিনতি, "কিছু না অমল, দোহাই তোমার। বর-কনে বাসরে বসেছে, ওদের এই রাতটাকে ধংস করে দিও না।"[২০]

জগৎ সংসারে ছবির মতো মেয়েরা সারাজীবন নিজেদের যন্ত্রণা বুকে বহন করে সীমারেখার সীমার মধ্যেই জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। অথচ শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত সংসারের কর্তব্য ক্ষমতা থেকে বিচলিত হয়

না। সমাজের মানুষের নানান কটুক্তির বাণে বিদ্ধ হয়েও নিজের জীবন সমস্যার কথা ব্যক্ত করতে পারে না ছবির মতো মেয়েরা। কিন্তু অমলের মতো বন্ধুরা এসে যখন বুকে পাথর চাপার প্রশ্ন উত্থাপন করে, তখন পুরুষতন্ত্রের লক্ষণগণ্ডির সীমায় আবদ্ধ সীতাদের মনের কথাটি ছবির মুখ দিয়ে অকপটে বলেছেন নারীদরদী গল্পকার আশাপূর্ণা — "পারতে তো হবেই অমল ! সীমারেখাটা ভুললে চলবে কী কেন ?"[২১] সারাদিন ধরে দরজার কপাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত ছবি অসভ্য অভদ্রের মতো অমলের মুখের ওপরে দরজাটি বন্ধ করে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অন্ধকারে শক্তি সংগ্রহের কাজে লেগে যায়। পাথরের মতো সকল অপমান লাঞ্ছনার আঘাত সহ্যকারী ছবির প্রতিবাদের শেষ শব্দটি ছিটকিনির শব্দের ব্যঞ্জনায় লেখিকা স্পষ্ট করে দেন।

বিয়ের যাবতীয় কাজ সেরে, মৃত স্বামীর দেহকে পাহারা দিয়ে, মৃত্যুসংবাদ চেপে সুষ্ঠু ভাবে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হতে সাহায্য করে ছবি এখন ক্লান্ত। সংসারের এতসব দায়িত্ব সামলে কর্তব্য পরায়ণ নারীরা রাতের খানিকটা ঘুমের মাধ্যমে সারাদিনের এই ক্লান্তি মোচন করে। কারণ তারা জানে পরদিন আবার সংসার যুদ্ধে নিজেকে নিয়োগ করতে হবে। ছবিও এত ক্লান্তির পর স্বামীর শীতল শবদেহের পাশে একটু ঘুমোনোর অবকাশ খোঁজে। যাতে সকালে স্বাভাবিক ছন্দে 'ধনুক ভাঙা পণ'কে দূরে সরিয়ে নীচে নেমে গিয়ে সহজ ভাবে বলতে পারে, "কাল বিয়ের গোলমালের মধ্যে তোমাদের আর ব্যস্ত করিনি, কিন্তু আর বোধহয় না করলে চলবে না।"[২২]

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর নারীত্বের অনুভব দিয়ে তখনকার মধ্যবিত্ত সমাজে ছবিদের মতো মেয়েদের অবস্থানটি বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি বুঝতে পেরেছিলেন তাদের জীবন সমস্যার দিকগুলো। আর সেইসব চিত্রই আশাপূর্ণা আপন সূক্ষ্ম তুলির টানে আঁকতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে। সংসারের যাঁতাকলে নারী একটা কর্তব্যের যন্ত্র মাত্র। আলোচ্য গল্পটিতে নায়িকা চরিত্রের অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা, স্থৈর্য-ধৈর্য আর আহত আত্মসম্মান বিরল ভাষা পেয়েছে লেখিকার নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে।

(চার)

আলোচনার অন্তিমে এসে আমরা বলতে পারি আশাপূর্ণার নারীরা পুরুষের পদতলে চাপা পড়ে ঘাসের মতো আবার নিজের আস্তিত্ব বজায় রাখতে লড়াই করে চলে। সমস্যার দুকূল ছাপিয়ে তারা যেমন আত্মশক্তিতে বলিয়ান হতে জানে, তেমনি সমস্যার সংকটে পড়ার পূর্বে সাবধান হতেও জানে। এভাবে তারা সকল দিক রক্ষা করে হয়ে ওঠে দশভূজা প্রতিমূর্তি। সমস্ত অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে স্বামী সন্তান বা সংসারকে আঁকড়ে থেকে আত্মমর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি তাদের আচরণে সূক্ষ্ম প্রতিবাদের ধ্বনি অনুরণিত হয়েছে। আলোচ্য **'সীমারেখার সীমা'** গল্পটি তারই দোসর। নারী চরিত্রকে ও তাদের জীবন সমস্যাকে দেখার মতো তীব্র, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আশাপূর্ণার আছে— সেই দৃষ্টি-বুদ্ধি পরিশীলিত এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যক্তিগত অনুভূতি দিয়ে গড়া। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত দুঃখিনী নারীর জীবনভাষ্য রচনা করতে গিয়ে ভাবালুতাধর্মী আবেগ, রোমান্টিকতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। আধুনিক জীবনে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তাঁর নারীরা যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে বটে, কিন্তু আধুনিকতার বিলাসিতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি কোনোভাবেই। নারীর যা ন্যায্য এবং যা করণীয় তাই তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। বস্তুত তাঁর ছোটগল্পে আছে এক নির্মম কাঠিন্যের নৈপুণ্য; যা চরিত্রের ব্যবহারে, বচনে ও ব্যক্তিত্বের আলোতে ঝলসে উঠেছে। উপসংহারের তীরে পৌঁছে তাঁর সম্পর্কে মৃণালের চিঠির একটি লাইন বারবার মনে পড়ে তা হল— "মা যে এক সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্বসংসারের।"[২৩] আশাপূর্ণা তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রের মাধ্যমে সেই বিশ্বসংসারে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষা দিয়েই আলোচনার ইতি টানতে পারি, "কেবলমাত্র নারীপুরুষের সম্পর্কের মধ্যেই নয়, পারিবারিক জীবনের অন্যান্য সম্পর্কের মধ্যেও কত টানাপোড়েনের, কত ভেজাল নির্ভেজালের কারবার। নিরন্তর এই অফুরন্ত জীবনকে দেখে চলেছি, অনুভব করেছি, এবং বলেও চলেছি আমার ছোটোগল্পগুলির মধ্যেই বেশি।"[২৪] — এখানেই তাঁর ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর শিল্পীসত্তার অমরত্ব।

তথ্য সুত্র :

১. আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: , কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ: ১১৭
২. তদেব, পৃ: ৯
৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের এক শ বছর ১৮৯১-১৯৯০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : কার্তিক ১৮০৬, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ: ৩২১
৪. আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬
৫. তদেব, পৃ: ১৮
৬. তদেব, পৃ: ১৭
৭. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি আশাপূর্ণা দেবী' উল্লেখিত আশাপূর্ণা দেবী মেমোরিয়াল কমিটি (সম্পাদিত) আশাপূর্ণা দেবী জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৫শে বৈশাখ ১৪০৬, পৃ: ২৪
৮. উপাসনা ঘোষ, 'আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে সময়ের ছবি' উল্লেখিত তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) বাংলা ছোটগল্প : পর্ব-পর্বান্তর, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫, পৃ: ১৫২
৮. আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪
১০. তদেব, পৃ: ৮
১১. আশাপূর্ণা দেবী, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন (লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত), নবনীতা দেবসেন লিখিত ভূমিকা অংশ, প্রাগুক্ত, পৃ: xviii
১২. উপাসনা ঘোষ, 'আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে সময়ের ছবি' উল্লেখিত তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) বাংলা ছোটগল্প : পর্ব-পর্বান্তর, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫০
১৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), একুশটি বাংলা গল্প (নির্বাচিত গল্প: 'সীমারেখার সীমা'), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, একাদশ পুনর্মুদ্রণ : ২০১২, পৃ: ৬৩
১৪. তদেব, পৃ: ৫৭
১৫. তদেব, পৃ: ৬১
১৬. তদেব, পৃ: ৫৮
১৭. তদেব, পৃ: ৬২
১৮. তদেব, পৃ: ৬৪
১৯. তদেব, পৃ: ৬৪
২০. তদেব, পৃ: ৬৫
২১. তদেব, পৃ: ৬৫
২২. তদেব, পৃ: ৬৫
২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ (উদ্ধৃতি 'স্ত্রীর পত্র') সাহিত্যম, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৪১৫, পৃ: ৬০৬
২৪. আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪